ধর্মের উৎস সন্ধানে*

দিগন্ত সরকার

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য যে সময়, সম্পদ আর যন্ত্রণার মূল্য দিতে হয়, তাতে একজন বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে ধর্ম একটি অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য। - মার্ক কোহেন

বিবর্তনের ভূমিকা

সব সমাজেই কেন ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই সে সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা রয়েছে। কিন্তু আমি এই বিশ্লেষণ শুরু করতে চাই ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব থেকে।

যেহেতু আমরা সবাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উদ্ভূত, আমাদের জানা দরকার প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের ওপরে কিভাবে ধর্মীয় অনুভূতিকে নির্বাচন করেছিল। সাধারণভাবে, সেই ব্যক্তিই প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয় যে সময় আর সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে। নাহলে তার প্রতিযোগী তার থেকে বেশি সুবিধা পেয়ে নির্বাচিত হবে। একজন বিবর্তনবাদীর কাছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল সময় আর সম্পদের অপব্যবহার। এক-একটি ধর্মস্থান বানাতে বছরের পর বছর লাগে। ধর্মে বিশ্বাসের কারণে শতশত মানুষের ওপর অত্যাচার হয়েছে। অন্ধবিশ্বাসীরা কত চাবুক খেয়েছে, কত রক্তপাত হয়েছে। তাহলে ধর্মের উপযোগিতা কোথায়?

প্রাকৃতিক নির্বাচনে, উপযোগিতা (merit) বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা সরাসরি ব্যক্তির জিন-প্রবাহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অন্যভাবে ভাবলে, যদি তা ব্যক্তির নিজের জিনের উপকার না করেও সেই প্রজাতির বা দলের সুবিধা করে, তাহলে? এটা হল প্রথম উপযোগিতা তত্ত্ব, যা দল নির্বাচন তত্ত্ব (Group Selection Theory) নামেও পরিচিত। এটি আমি পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুসারে, ব্যক্তির জিন অন্য কোনো জীবের জিন দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, ঠান্ডা সব মানুষেরই লাগে, যদিও তা থেকে মানুষের কোনো সুবিধা হয় না। অনেকক্ষেত্রেই জীবেরা এভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে তারা কোনো পরজীবীকে সহজে বহন করতে বা পরবর্তী পোষকে প্রবাহিত করতে পারে। তৃতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, আমরা জিনের পরিবর্তে সাধারণ যেকোনো প্রতিলিপিকারকের কথা ভাবতে পারি। ধর্মমত নিজেরা একসাথে নিজেদের প্রতিলিপিকরণে দক্ষ - তাই আজ সব মানুষের মধ্যেই কমবেশী ধর্মবিশ্বাস বর্তমান। এই তত্ত্ব নিয়েও আমি পরে বিশদ আলোচনা করব।

অস্ট্রেলিয়া বা পাপুয়া নিউগিনির উপজাতিদের কথাই ভেবে দেখা যাক। তারা এমন প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে, যেখানে কিছু বিষয়ে নিখুঁত বাস্তব জ্ঞান না থাকলে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব - আর তাদের সে দক্ষতা আছে। অথচ, তারাই আবার তাদের এই জ্ঞানের সাথে ডাইনি-তত্ত্ব বা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যা জুড়ে নিজেদের মধ্যেই ভীতি সৃষ্টি করেছে- নিজেদের অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে। কিম স্টেরেলনি, এক দার্শনিক, পাপুয়া নিউগিনির উপজাতিদের এই বৈপরিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। তার বক্তব্য - কি করে মানুষ একাধারে এতটা বোকা আর বুদ্ধিমান হতে পারে, তা এদের দেখলে বোঝা যায়।

পৃথিবীতে সব মানুষের মধ্যেই এই অপব্যয়ী, সময়সাপেক্ষ, বিভেদকামী ধর্মীয় সংস্কার আছে, আছে তথ্য-বিরোধী, উৎপাদন-বিনাশী, ধর্মীয় কল্পনা। একটি বিশেষ প্রজাতির মধ্যে ধর্মের এই সার্বিক উপস্থিতি একমাত্র ডারউইনের তত্ত্ব দিয়েই বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু, মানব প্রজাতি কেন এই অভ্যাসে মেতে ওঠে যাতে তার জীবনসংশয় অবধি হতে পারে?

ধর্মবিশ্বাসের সুবিধা

ধর্ম যে মানসিক অবসাদ কমাতে সাহায্য করে তা নিয়ে বিশেষ একটা প্রমাণ পাওয়া যায়না। হয়ত কিছু ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব খাটে, কিন্তু আমি অবাক হব যদি সামগ্রিক ভাবেও তা সত্যি হয়। এবিষয়ে জর্জ বার্নার্ড শ-এর উদ্ধৃতি মনে পড়ে - 'বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের চেয়ে বেশী শান্তিতে থাকে যেভাবে একজন মাতাল একজন ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী শান্তিতে থাকে।'

ডাক্তার রোগীকে আস্বস্ত করেন বা সান্ত্বনা দেন - সাধারণ রোগব্যাধী ডাক্তারের আশ্বাসেই সেরে যায়। একে বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা হয় 'প্লাসেবো (placebo) এফেক্ট'। নকল বড়ি বা অতি-তরলীকৃত হোমিওপ্যাথি ওষুধের প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে রোগীদের মধ্যে। মজার কথা, হোমিওপ্যাথির সুনামের একটা বড় কারণ হল, এর কোন প্রভাবই থাকে না - যেখানে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্ষতি হয়।

ধর্মও কি এরকমই এক 'প্লাসেবো' যা মানসিক অবসাদ দূর করে? উৎসাহীরা কিছু উদাহরণ নিয়ে উপস্থিত হলেও আমি সহজে তা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রভাব আমাদের চাপমুক্ত করার পরিবর্তে অযথা চাপ সৃষ্টি করে - পাপবোধ বা পুন্যের লোভ কি আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি করেনি? আমি একমত নই। সর্বত্র বিরাজমান ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপকতা বিশ্লেষণের জন্য সমমাপের তত্ত্ব প্রয়োজন।

এবিষয়ে বাকি তত্ত্বগুলো ডারউইনের বিশ্লেষনের সাথে ঠিক খাপ খায়না - যেমন : 'ধর্ম আমাদের অজানা সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেয়', 'ধর্ম সান্ত্বনা দেয়', ইত্যাদি। সান্ত্বনা-তত্ত্বের সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন স্টিভেন পিঙ্কার, তার বই *'হাউ আওয়ার মাইন্ড ওয়ার্ক্স'* তে। বরফে আটকে পড়া মানুষ বা সিংহের মুখোমুখি মানুষ ধর্মীয় সান্ত্বনা থেকে কি বিশেষ সুবিধা পেতে পারে যাতে তার প্রাণ-বিনাশের সম্ভাবনা কমে? সহজ কথায়, ধর্মীয় সান্ত্বনা কি তাকে কোনোভাবে নির্বাচিত হতে সাহায্য করে? মনে হয় না।

বিবর্তনবাদীরা আপাত আর মূল কারণকে আলাদা করে দেখতে চান। নিউরোলজিস্টরা বলবেন মস্তিষ্কের কোনো অংশের অধিক সক্রিয়তা ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। কিন্তু এটা আপাত কারণ - এ বিষয়ে আলোকপাত করছি না। যদি নিউরোলজিস্টরা বলেন এই ঈশ্বর-কেন্দ্রই ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্বের জন্য দায়ী, তাহলে বিবর্তনবাদীদের কাজ হবে খুঁজে বের করা কি কারণে এই ঈশ্বর-কেন্দ্র মানুষকে প্রাকৃতিক ভাবে সুবিধা দিয়েছিল যার ফলে এটি এখন মানব-প্রজাতির অবিচ্ছেদ্য অংগ।

'ধর্ম হল শাসকশ্রেনীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার যন্ত্র মাত্র' - এরকম রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও বিবর্তনবাদীরা মেনে নেবেন না। এটা হয়ত ঠিক যে আমেরিকায় দাসেরা পরকালের কথা ভেবে তাদের ইহজীবনের ক্ষোভ প্রশমিত করত - যার ফলে তাদের মালিকপক্ষের সুবিধা হত। কিন্তু এই তত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই - সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বের যা থাকা একান্ত দরকারী। ডারউইনের তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় কেন আমরা যন্ত্রণা অনুভব করি। যারা যন্ত্রণা অনুভব করে, তারা তা প্রশমিত করতে ব্যবস্থা নেয় - যারা অনুভব করেনা, তারা নেয় না। ফলে

তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও কমে যায় - সামান্য ক্ষত থেকেও তাদের মৃত্যু হতে পারে। তাহলে, নির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঈশ্বর বাসনার ব্যাখ্যা কি?

দলগত নির্বাচন তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুসারে, নির্বাচন কাজ করে প্রতিযোগী এক একটি দলের মধ্যেও। কেমব্রিজের আর্কিওলজিস্ট কলিন রেনফ্রু মনে করেন যে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আর আনুগত্যের কারণেই আব্রাহামিক ধর্মগুলি এত বিস্তার লাভ করেছে। আমেরিকান ডি এস উইলসন একি মতবাদ বিস্তৃত আকারে প্রকাশ করেছেন *'ডারউইনস ক্যাথিড্রাল'* বইতে।

একটা কাল্পনিক উদাহরণ দেখা যাক। কোনো এক উপজাতি হল যুদ্ধবাজ, যুদ্ধের দেবতায় বিশ্বাসী - মনে করে যুদ্ধে শহিদ হলে সরাসরি স্বর্গলাভ ঘটে। আরেক উপজাতির দেবতা শান্তিকামী, সহাবস্থানে বিশ্বাসী। এদের যুদ্ধ লাগলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধবাজ উপজাতি বেশী সুবিধায় থাকবে - তাদের সদস্যরা স্বর্গে যাবার জন্য যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত বলে। স্বাভাবিকভাবে, আস্তে আস্তে, এধরনের উপজাতি বড় হতে থাকবে, বেশী সম্পদের আধিকারী হবে, ছোট উপজাতি গুলোকে গ্রাস করবে। আনথ্রপলজিস্ট নাপোলিয়ন শাগন দেখিয়েছেন এরকম সত্যিই ঘটে - দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে।

দলগত নির্বাচন সম্পর্কে উইলসনের প্রত্যুত্তর

ডকিন্স তার লেখায় দলগত নির্বাচন (Group Selection) সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করেননি বলে দাবী জানিয়েছেন এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা ডেভিড উইলসন (David Wilson)। তিনি একাধিক পরীক্ষালব্ধ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

দলগত নির্বাচনের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল বিজ্ঞানজগতে স্বীকৃত লিন মার্গুলিসের এন্ডোসিমবায়োটিক (Endosymbiotic) তত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে, প্রোক্যারিওটিক (Prokaryotic) কোষ কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে সম্মিলিত বিবর্তনের মাধ্যমে জটিলতর ইউক্যারিওটিক (Eukaryotic) কোষের জন্ম দিয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'অরিজিন অব ইউক্যারিওটিক সেল' বইতে তিনি এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। আশির দশকে যখন প্রমাণিত হল যে মাইটোকন্ড্রিয়া আর ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে আবিষ্কৃত জেনেটিক বস্তু (Genetic Material) আসলে নিউক্লিয়াসে প্রাপ্ত জেনেটিক বস্তুর থেকে আলাদা, তখন এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। পরবর্তীকালে, হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্টের সময়ে এই তত্ত্বের স্বপক্ষে আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা যাকে আপাতদৃষ্টিতে একটি প্রাণী বলে মনে করছি সেটিও আসলে অনেকগুলি স্বতন্ত্র জীবের বিবর্তিত সহাবস্থানের ফলে সৃষ্ট। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জীবদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিযোগিতার চেয়ে দলগত সুবিধাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে সুবিধার জন্য অনেকগুলি জীবের এই সহাবস্থানকে দলগত নির্বাচন ছাড়া কি বা বলা যেতে পারে? তাই সবসময় ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাচনই শেষ কথা নয়, উপযুক্ত দলগঠনে সক্ষম হলে দলগত নির্বাচন ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাচনের পরিবর্তে প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

দলগত নির্বাচন তত্ত্ব আর মিম-তত্ত্ব (Meme Theory) একত্র করলে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক

ধারণা করা সম্ভব। মনে করা যাক কোনো প্রজাতির সাংস্কৃতিক তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষমতা খুব বেশী। এখন তাদের একটি দলের মধ্যে যদি একটি নতুন তথ্য বা ধারণার উদ্ভব হয় সেটা সহজেই তাদের নিজেদের দলে ছড়িয়ে পড়বে। এবার সেই তথ্য বা ধারণা যদি তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা পরিবর্তন করে তাহলেই দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, নবজাগরণের সময়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় যে বিজ্ঞানচর্চার শুরু হয়েছিল তার ফলে তারা দলগতভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। তাই, তাদের সংস্কৃতির প্রভাব সারা বিশ্বে আজ দেখা যায়। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার বিকাশের পরে মানুষের দলের আকার অনেক বেড়ে যায়, সমাজ গঠিত হয়, ধীরে ধীরে তৈরি হয় সামাজিক মনস্তত্ত্ব। আর এই সামাজিক মনস্তত্ত্ব পরে জন্ম দেয় ধর্মের।

পৃথিবীতে সব ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় সবারই উৎপত্তি হয়েছে সমাজের কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য, কিছু নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে। ধর্মে যে ধারণাগুলো আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানযুগে অচল, তাই দেখা যায় সময়কালে কিছু সমস্যার সমাধান করেছে। তারা ধর্মবিশ্বাসীদের দল-গঠনে কিভাবে প্রভাবিত করে তার ওপর নির্ভর করে এই আপাত-অবাস্তব ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, জৈনধর্মের অবাস্তব অহিংসতা নিজেদের মধ্যে সংগঠিত দল গঠনে সাহায্য করে।

তবে দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভব হলে প্রমাণিত হয় না যে ধর্ম খুব উপকারী বলে নির্বাচিত হয়েছে। এর প্রভাবেই মানুষ দল গঠন করে, যেমন অনেকগুলো জীব দল বেঁধে জটিল জীব গঠন করে। এখানে মানুষের এই দলগুলোকে একেকটি বিশাল জীবের সাথে তুলনা করা যায়। এরা একে অন্যের প্রতিযোগী, একে অন্যেকে 'শিকার' করে, প্রতিযোগিতার পেরে না উঠলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবেই উদ্ভব ঘটে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মের, একটি ধর্ম অন্যটির চেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করে।

উৎস - http://www.skeptic.com/eskeptic/07-07-04.html

আমাদের মত যারা দলগত নির্বাচনকে গুরুত্ব দেন না, তারাও মনে করেন তাত্ত্বিকভাবে এটা ঘটা সম্ভব। কিন্তু যখন দলের মধ্যে ব্যক্তিমাত্রায় নির্বাচনের কথা ভাবা হয়, তখনই গোলমাল দেখা দেয়। সাধারণভাবে, ব্যক্তিমাত্রায় নির্বাচন আরও বেশি প্রবল হওয়ার কথা। আমাদের কাল্পনিক উপজাতিদের মধ্যে মনে করা যাক আত্মত্যাগী মৃত্যুভয়হীন যোদ্ধাদের পাশাপাশি কোনো এক স্বার্থপর যোদ্ধাও আছে। তাতে যুদ্ধে জয়ীপক্ষ লাভ করার সম্ভাবনা হয়ত একটু কমে, কিন্তু নিজের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। বেঁচে বংশবিস্তার করার সম্ভাবনা বেশি বলে এধরনের ব্যক্তির জিন উপজাতিটির মধ্যে বেশী হারে ছড়িয়ে পড়বে। ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে যুদ্ধে আত্মত্যাগের সম্ভাবনাও কমে যাবে। এই সব ফ্যাক্টর মাথায় রেখে যদি কম্পিউটার সিমুলেশন করা যায় - তাহলে দেখানো খুবই সহজ যে দলের মধ্যে আত্মত্যাগীদের তুলনায় স্বার্থপরদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়েই বেশী।

ধর্ম কি অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় উপজাত?

যাই হোক, আমি এবার দলগত নির্বাচন ছেড়ে আমার নিজের মতবাদ নিয়েই আলোচনা করব। যে বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মকে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় উপজাত (By-product) বলে মনে করেন - আমি সেই দলে। ব্যাপারটা বিশদ ভাবে আলোচনা করার জন্য আমি প্রাণিজগতের একটা উদাহরণ দিতে পারি।

মথ মোমবাতির আলোয় ঝাঁপিয়ে পড়ে - ঘটনাক্রমে নয়, তারা নিজেদের মত করে আত্মহত্যা করে। কিন্তু এ যদি আত্মহত্যা হয়, তাহলে এ থেকে মথের কি সুবিধা হয়? না কি এটা মথের উপজাত প্রকৃতি যার মূলে অন্য সুবিধা লুকিয়ে আছে? বিশদ ব্যাখ্যা করা যাক। কৃত্রিম আলো তো কিছুদিন হলো পৃথিবীতে এসেছে - তার আগে রাতে চাঁদ-তারার আলোই আলোকিত হত। অসীম দূরত্বের আলোক-উৎস থেকে আসা সমান্তরাল রশ্মি সরলরেখায় পতংগকে চলতে সাহায্য করে। ধরা যাক কোনো পতংগের স্নায়ুতন্ত্র অনেকটা এভাবে তৈরী যাতে হয়ত তা সর্বদা আলোর সাপেক্ষে ৩০ ডিগ্রী কোণে চলতে পারে। পুঞ্জাক্ষি থাকায় এরকম নির্দিষ্ট কোণে আলোর উৎস রেখে চলাচল করা সহজ - কোনো একটি চক্ষুনালীতে আলোর উপস্থিতি থেকে কোণ নির্ধারণ করা যায় বলে। কিন্তু মোমবাতির আলোয় একই সূত্র প্রয়োগ করলে তারা শেষে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বাতির আগুনে ঝাঁপ দিতে বাধ্য। মথের এই আত্মবিসর্জন-প্রকৃতি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর হলেও মোমবাতির তুলনায় মথের জীবনে চাঁদ-তারার আলো পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী - তাই মোটের ওপর দিয়ে মথের এই প্রকৃতি মথের সুবিধাই করে দেয়।

এবার এই একই তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখানো যায় ধর্মবিশ্বাসের মত আবেগপূর্ণ যুক্তিবিরোধী মত, যার জন্য মানুষ এত সময় ও সম্পদ অপচয় করে, তাও মানুষের অন্য কোনো মনস্তত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপজাত। কি সেই মনস্তত্ত্ব, যা কিনা অন্য সময়ে কার্যকরী, কিন্তু একই সাথে মানুষকে অপচয়ী এক খেলায় মাতিয়ে তোলে?

আমার এই তত্ত্বের কেন্দ্রে আছে শিশু-মনস্তত্ত্ব। অন্য প্রজাতির তুলনায় মানুষের সুবিধা হল - একের পর এক মানবপ্রজন্ম জ্ঞানভান্ডারে নতুন জ্ঞান সংযোজন করে চলে, আর শিশুদের মাধ্যমে সেই জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মে প্রবেশ করে। শিশুরা নিজে থেকেও ছাদের ধারে না যেতে শিখতে পারে বা গভীর বনে একা একা না যেতে চাইতে পারে, কিন্তু যে শিশুরা বিনাপ্রশ্নে বড়দের কথা শুনে দ্রুত শিখে ফেলবে তাদের সুবিধা নিশ্চিত। মথদের মত শিশুদের এই বড়দের প্রতি অন্ধবিশ্বাস বা অনুকরণপ্রিয়তা ক্ষতিকর। কিন্তু একই মনস্তত্ত্ব তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে শিশু-মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরী হয় যাতে তারা সহজেই দলনেতা বা বড়দের কথা বিশ্বাস করে। শিশুরা যেহেতু বড়দের ভাল আর খারাপ পরামর্শের প্রভেদ জানেনা, তারা একই সাথে বিশ্বাস করে 'জলে পা ডোবাতে নেই, কুমীর থাকতে পারে', আর, 'পূর্ণিমার রাতে পাঁঠাবলি দিতে হয়' - যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সময় আর পাঁঠার অপচয় ছাড়া লাভ কিছুই হয়না। এই শিশুই বড় হয়ে তার সন্তানকে একই শিক্ষাদান করে - কিছু ঠিক আর কিছু বেঠিক - আর সেও তা বহন করে চলে।

এই মডেল অনুসারে আমরা ধারণা করতে পারি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি এলাকায় বিভিন্ন অযৌক্তিক ভিত্তিহীন বিশ্বাস বংশানুক্রমে প্রচলিত। কুসংস্কার বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান এভাবেই আঞ্চলিকভাবে উদ্ভূত - বংশানুক্রমে প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাষার মতই সময়ে সময়ে সামান্য আকারে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। একজায়গায় উৎপন্ন বিশ্বাস বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে, কখনও বা আঞ্চলিক বিশ্বাসের সাথে মিশে গেছে।

ধর্মীয় নেতারা নিষ্পাপ শিশুদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত। তাই ধর্মযাজকেরা গর্ব করে বলেন - 'আমাকে প্রথম সাত বছরের জন্য একটি শিশুকে দিলে তাকে আমি সম্পূর্ণ মানুষ করে দিতে পারি'। সাম্প্রতিক কালে জেমস

ডবসন (*ফোকাস অন দ্য ফ্যামিলি* - খ্যাত) বলেছেন - 'শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করেন'।

ধর্মোপযোগী মানসিক কাঠামো

এবার, বিবর্তনবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে ধর্মকে পর্যালোচনা করা যাক। তাদের মতে মস্তিষ্ক কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিত, যাদের একেকটির কাজ একেক রকমের। কোনো অংশ যদি ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ন্ত্রণ করে তো আরেকটি সমবেদনা জাগিয়ে তোলে। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অংশ, দলগঠনের মানসিকতা আর নিজেদের দলের সদস্যকে অন্য দলের সদস্যের তুলনায় বেশী প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতার নিয়ন্ত্রণকারী অংশ - এদের প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে উপজাত প্রবৃত্তি হল ধর্মপরায়ণতা। এরা আসলে মানুষের ভাল বৈশিষ্ট্য হলেও কিছু ক্ষেত্রে এরা হিতে-বিপরীত করে, মথের আলোক-পরিচালিত দৃষ্টির মত।

পল ব্লুম, আমার মতই উপজাত-তত্ত্বে বিশ্বাসী আরেক মনস্তাত্ত্বিক, ধারণা করেন যে ধর্ম দ্বৈতবাদের (Dualist) উপজাত। দ্বৈতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন শরীর ও মন দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্ত্বা - মন এক অপার্থিব সত্ত্বা। অপরদিকে, অদ্বৈতবাদীরা বিশ্বাস করেন মন শরীরেরই অংশ। দ্বৈতবাদীরা মনে করেন মন হল একরকম কায়াহীন আত্মা নিয়ে তৈরী, যা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মত আমিও দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী নই - কিন্তু আমারও সহজাত দ্বৈতবাদী প্রবৃত্তি আছে। ব্লুম দেখিয়েছেন, প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা দ্বৈতবাদে অনেক বেশী বিশ্বাসী - যা থেকে ধারণা করা যায় যে মস্তিষ্কের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রবণতা সহজাত। শুধু তাই নয়, শিশুরা সব ঘটনাকে কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ করতে চায় - যেমন, মেঘের কারণে বৃষ্টি বা সূর্যের কারণে আলো পাওয়া যায়। শিশুদের এই প্রবৃত্তিকে টেলিলজি (Telelogy) বলে।

সহজাত দ্বৈতবাদ আর টেলিলজির কারণে, সঠিক পরিবেশে প্রভাবে মানুষও ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে - যেভাবে মথেরা মোমবাতির আলোয় ঝাঁপ দেয়। দ্বৈতবাদ অনুসারে মানুষ ধারণা করে যে মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আর টেলিলজির কারণে মনে করে যে সৃষ্টির কারণ হল কোনো অপরিসীম শক্তিধর ঈশ্বর। কিন্তু, উপজাত তত্ত্ব অনুসারে, মথের আলোক-পরিচালিত দৃষ্টির মত এই দ্বৈতবাদ আর টেলিলজিরও কিছু উপকারী দিক থাকা উচিত। দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেটর প্রবণতাগত তত্ত্বে (Intentional Stance) আমরা সেই উপকারী দিক খুঁজে পাই।

প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক প্রাণিজগৎ ও পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে বুঝতে ও অনুমান করতে আমরা যে অবস্থান গ্রহণ করি, তাকে ডেনেট তিনটি ভাগে ভাগ করেন - ভৌত অবস্থান, পরিকল্পিত অবস্থান ও প্রবণতাগত অবস্থান। ভৌত অবস্থানে (Physical Stance) মানুষ সবকিছু বিশ্লেষণ করে - যাচাই করে প্রতিটি অংশের কাজ আর কিভাবে তারা সংযুক্ত। কিন্তু এই অবস্থান যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। পরিকল্পিত অবস্থানে (Design Stance) বারবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর সম্পর্কে ধারণা করে - যেমন চাকা গড়ায় বা মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। এটা একধরণের শর্টকাট, যা আমরাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, ধরে নিই হৃৎপিন্ড পরিকল্পিত হয়েছে রক্ত পাম্প করার জন্য।

প্রবণতাগত অবস্থান হল আরো একটা শর্টকাট যা পরিকল্পিত অবস্থানের থেকেও কম সময়সাপেক্ষ। এই অবস্থানে প্রতিটি সত্ত্বাকে উদ্দেশ্যপ্রবণ বলে ধরা হয় - আর তাদের উদ্দেশ্য অনুমান করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সামনে পড়লে বাঘের উদ্দেশ্য অনুমান করতে দেরী হলেই সমস্যা। এই অবস্থায় বাঘ কি করে নখ বের করবে বা

ঝাঁপ দেবে তা ভাবতে গেলে বাঁচার সম্ভাবনা কমে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে পরিকল্পিত অবস্থানের মতই এই অবস্থানও সমস্ত ধরণের বস্তু (প্রকৃতপক্ষে যার উদ্দেশ্য আছে, বা যার নেই) সম্পর্কেই নেওয়া সম্ভব।

এটা সহজবোধ্য যে প্রবণতাগত অবস্থানের সাথে বেঁচে থাকার সম্ভাবনার নিবিড় সম্পর্ক আছে। সামাজিক পরিস্থিতিতে এই অবস্থানের মূল্য আরও বেশী, সেখানে এমন কি অধিকতর মাত্রার প্রবণতাগত অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় মাত্রার প্রবণতার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন পুরুষ বিশ্বাস করে যে আরেকটি নারী তাকে পছন্দ করে। চতুর্থ মাত্রায় বলা যায়, এক মহিলা ভাবছেন যে ওই ব্যক্তি জেনে গেছে যে সে চুরি করেছে। এভাবে আরো বেশী মাত্রার কথা ভাবা যেতে পারে - যেগুলো সামাজিক জীবনযাপনের জন্য জরুরী।

প্রবণতাগত অবস্থান মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় বলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কের বিন্যাসে তা জায়গা করে নিয়েছে। তাই আমরা সহজাত ভাবেই সব গুরুত্বপূর্ণ সত্ত্বারই উদ্দেশ্য বিশ্লেষনের চেষ্টা করি। এই অবস্থান মানুষের বন্ধু-শত্রু নির্বাচনে যেমন সাহায্য করে, তেমনই উপজাত হিসাবে প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেও অভিপ্রায় আরোপ করতে প্রবুদ্ধ করে। এ জন্যই আদিবাসী বা আদিম মানুষেরা ঝড়, বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায় সন্ধান করেছে। ব্লুমের মতে, শিশুদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়।

নৃতত্ত্ববিদ হেলেন ফিশারের মতে ধর্ম আমাদের ভালবাসা-প্রবণতার উপজাত। এই প্রবণতার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়েই বেশী। তার যুক্তিতে ভালবাসা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রেমিকাকে প্রেমিক আর দশজন মহিলার চেয়ে শতগুণ সুন্দর বলে দাবী করে, যদিও বাস্তবে তা কোনোভাবেই ঠিক নয়। তাছাড়া, একসাথে বিভিন্ন খাবার পছন্দ করে, বিভিন্ন জামাকাপড় পরতে চায়, কিন্তু একজন সাধারণত একসাথে একাধিক ব্যক্তির প্রেমে পড়ে না। ফিশার দেখিয়েছেন প্রেমে পড়া মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ রাসায়নিক ভারসাম্য বজায় রাখে। আর সেই অবস্থা নির্বাচিত হয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বিবর্তনবাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করা যায়। গুহাজীবনে যে শিশুদের বাবা-মায়েরা তাদের বড় করে তোলা অবধি নিজেদের বোঝাপড়া ও ভালবাসা বজায় রাখতে পেরেছিল, তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও বেশী ছিল - আর তার নিয়ন্ত্রক জিন নির্বাচিতদের মধ্যে বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভালবাসার সাথে ধর্মপরায়ণতার সাদৃশ্য প্রচুর। উভয়েই কিছু স্বস্তি-সান্ত্বনা দেয়, বিপজ্জনক বিশ্বে লড়াই করে বাঁচার সাহস দেয়। তাই ভালবাসা-প্রবণতার উপজাত হিসাবে ধর্মপরায়ণতার সৃষ্টি - তা বিশ্বাসযোগ্য। মথের আলোক-পরিচালিত দৃষ্টির সাথে এখানে তুলনা চলে নারী-পুরুষের ভালবাসাকে, যা তাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম দিয়ে নির্বাচিত হতে সাহায্য করে, আর আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সাথে তুলনা চলে ধর্মপরায়ণতার, যা এক ক্ষতিকর উপজাত।

জীববিজ্ঞানী লুইস ওল্পার্টের মতে যেকোনো ধারণার সর্বজনীন-করণ হল একরকম গঠনমূলক অযৌক্তিকতা (Constructive Irrationality)। বিপদসংকুল গুহাজীবনে বা শিকারের সময় মানসিক পরিবর্তনশীলতা একটা ক্ষতিকর প্রবৃত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। গঠনমূলক অযৌক্তিকতা এই পরিবর্তনশীলতার বিরুদ্ধে কাজ করে। সহজ কথায়, নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করে নতুন যুক্তিতে ধারণা পরিবর্তন করার থেকে কখনও কখনও অযৌক্তিক ধারণা বয়ে চলা সহজ। ওল্পার্টের মতে ভালবাসা আর ধর্মপরায়ণতার সৃষ্টি এই গঠনমূলক অযৌক্তিকতার উপজাতরূপেই। একই ভাবে রবার্ট ট্রিভার বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবঞ্চনার ব্যাখ্যা

দিয়েছেন। লিয়নেল টাইগার বলেছেন মানুষের এক প্রবৃত্তির কথা - মানুষ যা দেখতে চায়, তাই বেশী করে দেখে, যার সাথে আগে বঞ্চনার অভিজ্ঞতা আছে, তার কথা শুনলেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ধর্ম এদেরও কমবেশী উপজাত।

আবার পুরনো মতামতে ফিরে যাওয়া যাক। নিষ্পাপ শিশুদের মনে প্রাপ্তবয়স্করা কিছু অযৌক্তিক 'ভাইরাস' প্রবেশ করিয়ে দেয়। কিন্তু কোনো 'ভাইরাস' কি অন্যের থেকে বেশী শক্তিশালী হতে পারে? কোনো 'ভাইরাস' কি মনে জায়গা করে নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে দক্ষ? সত্যি কথা বলতে, 'ভাইরাস' গুলোর তুলনামূলক যোগ্যতার ওপর খুব একটা কিছু নির্ভর করে না। এখানে যোগ্যতা (merit) বলতে শুধু মনে জায়গা করে নেওয়া আর ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাকেই বোঝানো হচ্ছে। এই 'ভাইরাস' গুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধাঁচে কোনো নির্বাচন কাজ করে কিনা সে বিষয়ে আমি আগ্রহী। কোনো ধারণার অন্যের তুলনায় বেশী আবেদন আছে কিনা বা মানব মনস্তত্ত্বের সাথে কোন ধারণা সুসঙ্গত - তা ভাবার বিষয় হতে পারে।

বিবর্তনের মডেলেও দেখা গেছে, নির্বাচন ছাড়াও পরিবর্তন সম্ভব। কোনো জিন যদি রূপান্তরিত হয়ে প্রায়-সমধর্মী আরেকটি জিনে পরিণত হয়, তাহলে তা নির্বাচনের সম্মুখীন হবেনা, কারণ জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে কোনো পরিবর্তন হবেনা। এভাবে বংশানুক্রমে পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত জিনটি জিন-পুল থেকে মূল জিনকেই সরিয়ে দিতে পারে। বাহ্যিক পরিবর্তন সামান্যই লক্ষ্য করা গেলেও এই প্রক্রিয়ায় মূল অন্তর্গঠনের পরিবর্তন হতে পারে। একে বলে জেনেটিক ড্রিফট (Genetic Drift)। আমাদের সংস্কৃতিতে এইরকম ড্রিফটের তুলনা পাওয়া যায়। ভাষা এই একই প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মূল সংস্কৃত থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা-উপভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এদের কোনো একটির অন্যটির তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার প্রশ্ন নেই, কিন্তু ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে একেকটি ভাষায় পরিনত হয়েছে। ধর্মমতগুলোও কোনোভাবে উৎপন্ন হয়ে একই ভাবে ড্রিফটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে - কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনেই। তাই ভাষার মত, ধর্মেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। একসাথে, নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কিছু ধারণা বহুলভাবে প্রচারিত হয় - যেমন অবিনশ্বর আত্মার ধারণা বা স্বর্গ-নরকের ধারণা।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে একই ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরস্পরের পরিপূরকরূপে কাজ করে ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রশ্ন হল, কিভাবে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে ধর্ম বিন্যস্ত হল? কোনো 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের'(Intelligent Design) মাধ্যমে নাকি নির্বাচনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে? আমার মনে হয় উভয়েরই এতে কিছুটা ভূমিকা আছে। ধর্মীয় নেতারা সুচতুর ভাবে ধর্মের পরিকল্পনা করেছেন, যাতে তা সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। আবার, তারা পরিকল্পনা না করলেও সে বিশ্বাস হয়ত ভিন্নমতের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রচারিত হত।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছু সুবিধাজনক প্রবৃত্তির উপজাত হিসাবে ধর্মপরায়ণতা উদ্ভূত হলেও, এই তত্ত্ব থেকে ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করা যায়না। বিশদভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ধর্মমতগুলোর মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কেও আলোচনা করতে হয়। ধর্ম কি তাহলে কিছু মিম(meme) দিয়ে গঠিত?

মিমবিন্যাস ও ধর্ম

'ধর্মে, সত্য বলতে সেই ধারণা বোঝায় যা বেশিদিন ধরে সমাজে টিঁকে আছে।' - অস্কার ওয়াইল্ড

প্রাকৃতিক নির্বাচন সাধারণভাবে সেই জিন গুলোকে নির্বাচন করে যা ব্যক্তির বেঁচে থাকার বা প্রজননের সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। জিন এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে প্রতিলিপিকারক (Replicator) হিসাবে। কিন্তু, প্রাকৃতিক নির্বাচন যেকোনো প্রতিলিপিকারকের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। প্রতিলিপিকারক বলতে এখানে সেই সাংকেতিক তথ্যকে বোঝানো হচ্ছে যা নিজের হুবহু নকল করতে পারে, বা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত আরেক প্রতিলিপিকারক গঠন করতে পারে। প্রতিলিপিকারকের আদর্শ উদাহরণ হল জিন - যা DNA সজ্জার নিখুঁত প্রতিলিপি গঠন করতে সক্ষম। মিম-তত্ত্ব অনুসারে, মিমও এরকমই আরেক প্রতিলিপিকারক, যা আসলে সাংস্কৃতিক তথ্যের একক (Unit of Cultural Information)। হয়ত মিমেরা জিনের মত অত ভালো প্রতিলিপিকারক নয়, তবে মিম যত হুবহু নকল হবে, তত মিম-তত্ত্ব ভালভাবে কার্যকর হবে।

অনেকেরই মনে হতে পারে যে মিমের ক্ষেত্রে প্রতি প্রজন্মে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা এত বেশি, যে মিম-তত্ত্ব আদৌ কার্যকর হবেনা। প্রশ্ন আসে মিম কোথায় অবস্থান করে? শুধুমাত্র মানুষের মস্তিষ্কে? না প্রতিটি ই-মেল, এমনকি কাগজে লেখা কবিতাও কি মিম? আমার মতে মিমের প্রতিলিপি গঠনের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ অবান্তর। মনে করুন একজন বৃদ্ধ কাঠমিস্ত্রী একজন তরুণ শিক্ষানবিশকে কাজ শেখাচ্ছেন। শিক্ষানবিশ কি তার সব সব কর্মপদ্ধতি হুবহু নকল করবেন? তা নয়, তিনি তার শিক্ষকের উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, যাতে পরে তিনি সেটা পরে করতে পারেন। একট পেরেক পুঁতে ফেলতে হাতুড়ির কটা ঘা লাগে সেটা মাথায় না রেখে বুঝে নেবেন যে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক পুঁতে ফেলতে হবে। একই পদ্ধতিতে প্রজন্মের পরে প্রজন্ম কাপড় সেলাই, ওরিগামি, মাটির কাজ সব কৌশলই নিখুঁতভাবে হস্তান্তর হতে থাকে।

সুসান ব্ল্যাকমোরের 'দ্য মিম মেশিন' বইয়ের ভূমিকায় আমি একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম। আমি ছোটোবেলায় আমার বাবার কাছ থেকে একটি ওরিগামি (Origami) শিখেছিলাম। ওরিগামিটা বেশ শক্ত ছিল, তাতে ৩২ টা ধাপ ছিল। শেষে একটা সুন্দর অবয়ব পাওয়া যেত। এমনকি মাঝপথেও তিন-চার রকম অবয়ব তৈরী হত, ঢাকা দেওয়া বাক্স বা ছবির ফ্রেমের মত দেখতে। আমাদের বোর্ডিং স্কুলে মেট্রন এই ওরিগামি খেলা চালু করেছিলেন। খেলাটা কদিন চলেছিল, তারপরে আবার উধাও হয়ে গিয়েছিল। ছাব্বিশ বছর পরে আমি আবার সেই স্কুলে গিয়ে একই খেলা চালু করলাম, আবার খেলাটা কদিন চলে বন্ধ হয়ে গেল। এই ধরনের খেলা শুধুমাত্র মিম-প্রবাহের মাধ্যমেই চলতে থাকে, অবিকল একই দক্ষতায়। আমার বাবাদের সময়েও একই ভাবে খেলা শিখেছিলেন তিনি, আমার থেকে তিরিশ বছর আগে।

এবার একটা কাল্পনিক পরীক্ষার কথা ভাবা যাক। ২০০ জন ছাত্রকে ডেকে ২০টা লাইনে আলাদা করে দাঁড় করানো হল। এরা কেউই ওরিগামিটা আগে করেনি। এবার তাদের মধ্যে থেকে এক এক জনকে ডেকে তাদের ওরিগামিটা করে দেখানো হল, আর বলা হল পরেরজন কে একই ভাবে সেটা করে বোঝাতে। এভাবে পরের পর ছাত্রদের মধ্যে ওরিগামি হস্তান্তর চলতে থাকল ২০টা সমান্তরাল লাইনে, যেমন ভাবে প্রজন্মের পরে প্রজন্মে মিম হস্তান্তর হয়। শেষে ২০টা আলাদা ওরিগামি অবয়ব তৈরী। আমার ধারণা, এদের অধিকাংশই প্রথমটির মতই নিঁখুত হবে। হয়ত দুয়েকজন 'উইক লিংক' এর জন্য কিছু লাইনে করেকজনের পরে আর ঠিকঠাক ওরিগামি হবেনা। খুব অল্প ক্ষেত্রে ওরিগামির সামান্য রূপান্তর লক্ষ্য করা যেতে পারে। এরপরে ওই একই পরীক্ষা করা হল একটা আঁকা ছবি নিয়ে। এবার কিন্তু ২০টা লাইনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি পাওয়া যাবে - প্রজন্মের হস্তান্তরের ফলে ওরিগামির নিঁখুত থেকে গেলেও ছবি আঁকা পরিবর্তিত হয়েছে।

কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হল, ছবি আঁকা আর ওরিগামির মধ্যে পার্থক্য কোথায় যে একটা কৌশল (skill) নিঁখুতভাবে নকল করে ফেলা যাচ্ছে আর আরেকটা যাচ্ছে না? পার্থক্যটা পদ্ধতিগত। ওরিগামির কৌশলে প্রতিটি ধাপে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্দিষ্ট, প্রায়শই কাগজটাকে মাঝখানে ভাঁজ করতে বলা হয়। একজন একধাপে ভুল করলেও পরেরজনে সেটা ধরে ঠিক করে ফেলতে পারে। তাই, ধাপ গুলোকে 'ডিজিটাল'(digital) বলা যায়। কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে ঘটনাটা আলাদা। একবার ছবিতে পরিবর্তন এলে সেই পরিবর্তন ঠিক করে ফেলা প্রায় অসম্ভব, এর মধ্যে স্ব-সংশোধন ক্ষমতা নেই। ছবি আঁকার কৌশল তাই 'এনালগ'(Analog)। তাতে বেশি পার্থক্য তৈরী হয়। শব্দ বা বাক্যও এরকম স্ব-সংশোধক্ষম (Self-normalizing), যদি সেটা ভাল করে বোঝা সম্ভব হয়। একই ভাবে দাঁড় করানো ছাত্রদের মাতৃভাষায় একটা সংক্ষিপ্ত বাক্য বলে দিলে তারা সেটা শেষ পর্যন্ত হুবহু নকল করতে পারবে, কিন্তু অজানা কোনো ভাষায় হলে পারবেনা, আঁকা ছবির মতই দশা হবে তার। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে সব মিম একই ভাবে নিজের প্রতিরূপ গঠন করতে পারেনা, কিছু মিম বেশি নিখুঁত ভাবে প্রবাহিত হয় অন্যেদের চেয়ে।

সুসান ব্ল্যাকমোরের *'দ্য মিম মেশিন'* বইয়ে মিম-তত্ত্ব নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি কল্পনা করেছেন সারা পৃথিবীজোড়া মস্তিষ্ক - আর মিমেরা নেমেছে মস্তিষ্কে স্থান দখলের লড়াইতে। জিন পুলের মতই মিম পুলেও সেই মিমই বেশি করে স্থান পায় যা ভাল প্রতিলিপি গঠনে সক্ষম। কোনো মিমের নিজস্ব আবেদন থাকার কারণে বা কোনো মিমের সাথে পুলে বিদ্যমান মিমগুলোর সহাবস্থানের ক্ষমতার কারণে মিমেরা মিম-পুলে স্থান পায়। দ্বিতীয় কারণ থেকে তৈরি হয় 'মেমেপ্লেক্স' (Memeplex) বা মিম-সমষ্টি, যারা একসাথে সহাবস্থান করে। এই মেমেপ্লেক্সর অনুরূপ জিনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। প্রতিটি জিনের সাথে জিন বাহকের এক বা একাধিক বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জড়িত আছে। যে জিনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জিন বাহকের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাহককে সাহায্য করে, সেই জিনই নির্বাচিত হয়। তার সাথে, যে জিন বাদবাকি জিনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা, সেও একই কারণে জিন-পুলে নির্বাচিত হবেনা। যেমন, নিরামিশাষী জিন-পুলে মাংসাশী জিন-পুলে নির্বাচিত হবেনা। মেমেপ্লেক্সও এভাবেই কাজ করে - সহাবস্থানক্ষম মিমদের নিয়ে। যে মিমগুলো নিজেরা মিম-পুলে স্থান পেতনা, তারাই হয়ত মিম-পুলে ভালভাবে স্থান করে নেয় অন্য মিমের উপস্থিতিতে।

এবার মিম-তত্ত্ব দিয়ে ধর্মকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কিছু ধর্মীয় মত নিজস্ব আবেদনের মেমেপ্লেক্সে স্থান পায়, আর কিছু স্থান পায় কারণ তারা মেমেপ্লেক্সে বিপুলভাবে বর্তমান মিমগুলির সাথে খাপ খায়। আমি প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত মিমদের একটা তালিকা বানাবার চেষ্টা করলাম :

- মৃত্যুর পরে জীবনলাভ সম্ভব।
- শহিদ হলে স্বর্গে গিয়ে ৭২ জন কুমারীর সান্নিধ্যলাভ হবে।
- নাস্তিক, ধর্মবিরোধী আর বিধর্মীদের মেরে ফেলা উচিত (অথবা, তাদের বা তাদের পরিবার একঘরে করে ফেলতে হবে)।
- ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এক মহৎ গুণ। বিশ্বাসে কোনভাবে চিড় ধরলে তাকে আবার ঠিক করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে।
- বিশ্বাস (প্রমাণ ছাড়া) এক মহৎ গুণ। যত কম প্রমাণ সহ বিশ্বাস করা যায় ততই গভীর হয় বিশ্বাস। আর বিশ্বাসীরা পুরষ্কৃত হয়।
- যারা ধর্মবিশ্বাসী নয়, তাদেরও ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত।
- ধর্মে কিছু অদ্ভূত ঘটনা থাকে যা বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। এদের বিশ্বাস করতে শেখা উচিত।
- শ্রুতিমধুর গান-বাজনা, সুন্দর চারুকলা বা শ্লোক - এরা সবই ধর্ম থেকে উদ্ভূত।

একেকটি ধর্মকে একেকটি মেমেপ্লেক্স বলে কল্পনা করা যেতে পারে। ইসলামকে যদি মাংসাশী মেমেপ্লেক্স বলা যায় তাহলে বৌদ্ধধর্মকে নিরামিশাষী মেমেপ্লেক্স ধরে নেওয়া যায়। একটি মেমেপ্লেক্সকে (ধর্ম) আরেকটির চেয়ে ভাল বলে ধরা যায় না। ধর্মীয় মিম গুলো একে অপরের উপস্থিতিতে বিকাশ লাভ করে ও সহজেই নিজস্ব মেমেপ্লেক্সের সাহায্যে মিম-পুলে স্থান পায়।

তাহলে এই মিম-তত্ত্বের সাথে পূর্ববর্ণিত জিনগত তত্ত্বের সংযোগ কিভাবে সাধন করা সম্ভব? প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে গঠিত হয়েছে যাতে তা মিম-বোঝাই হয়ে থাকতে পারে। অনেকটা মনে করা যেতে পারে যেন মস্তিষ্ক হল একটা হার্ডওয়র প্ল্যাটফর্ম (Hardware Platform) আর অপারেটিং সিস্টেম (Operating system) নিয়ে গঠিত, যা আসলে জিন-কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভূত। আর মিম হল তার মধ্যে 'ইনস্টলড সফটওয়র' (Installed Software)। আমার ধারণা, প্রথমে মিমগুলো বিচ্ছিন্ন আকারে জনমানসে স্থান পেয়েছে নিজস্ব আবেদনের কারণে। এই অবস্থায় ধর্মীয় মিম গুলো মূলত ছিল মানসিক কাঠামোর উপজাত। পরে তাদের মধ্যে থেকে সহাবস্থানক্ষম মিমদের একত্র করে সংঘবদ্ধ (Organized) ধর্ম বা মেমেপ্লেক্স গঠিত হয়েছে। এভাবে জিন এবং মিম উভয়েই ধর্মের বিবর্তনে অংশগ্রহণ করেছে।

কার্গো কাল্টের কথা

কার্গো কাল্ট (Cargo Cult) হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ গুলিতে বর্তমান ধর্মবিশ্বাসগুলোর একটি সম্মিলিত নাম - যারা কার্গো-জাহাজ গুলোকে স্বর্গীয় দূতের পাঠানো সামগ্রী মনে করত। জাহাজের ইউরোপিয়ান নাবিকেরা কিভাবে রেডিও শোনে, কেন কোনো সারাইয়ের কাজ করতে হয়না, রাতে কি করে আলো জ্বালায় - এ সবই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা অদ্ভূত বিস্ময়ে দেখত। ভানুয়াটুর (Vanuatu) তান্না (Tanna) দ্বীপে, কার্গোয় আসা আমেরিকান নাবিকদের এমনকি পূজো করা হত। আসলে উন্নত টেকনলোজির সাথে ম্যাজিকের বিশেষ একটা পার্থক্য নেই। তাই আদিবাসীরা সহজেই তাদের স্বর্গীয় দূত বলে মেনে নিত। তাদের ধর্মবিশ্বাসে পরবর্তীকালে এইসব 'ম্যাজিক'-এর ধারাও প্রবেশ করে, এমনকি নতুন ধর্মও তৈরী হয়।

তান্নায় এরকমই একটি কাল্ট এখনো আছে জন ফ্রামকে কেন্দ্র করে। সরকারি নথি অনুসারে জন ফ্রাম ১৯৪০ সালে দ্বীপে এসেছিলেন, যদিও নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেনা যে এ নামে সত্যি কেউ ছিল। সে অনেকগুলো ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিল - দ্বিতীয়বারে জাহাজভর্তি সামগ্রী আনবে ও সাদা আমেরিকানদের চিরকালের মত দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হবে বলে। আরো ভয়ানক, সে বলে গিয়েছিল পরেরবারে আসার পরে আমেরিকানদের কারেন্সী তুলে দেওয়া হবে, তাই এর মধ্যে সবাই যেন তা শেষ করে ফেলে। ১৯৪১ সালে সেই আশায় আদিবাসীরা কাজ বন্ধ করে দিলো আর যা টাকাপয়সা ছিল তা দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে থাকল। দ্বীপের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিছুদিন পরে যখন আমেরিকান সৈন্যরা জাহাজে করে পৌছল দ্বীপে, তারা মনে করল জন এসে গেছে। কোন এক নেতার বক্তব্য অনুসারে দ্বীপের মাঝে রানওয়ে বানানো হল যাতে আমেরিকার রাজা্ জন এসে নামতে পারে। বাঁশের হেডফোন, কন্ট্রোল টাওয়ার বানানো হল, যাতে জনের নামতে অসুবিধা না হয়।

ডেভিড অটেনবারো পঞ্চাশের দশকে সেখানে গিয়ে আবিস্কার করেন নাম্বাস নামে এক পুরোহিত এই নবগঠিত কাল্টের দায়িত্বে আছে - সে জনের সাথে নিয়মিত রেডিওতে যোগাযোগও রাখে। রেডিও থাকে জনের কাছে। অপরপ্রান্তে এক বৃদ্ধা, যার কোমরে বিদুতবাহী তার জড়ানো, মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে অস্ফুটস্বরে কথা বলতে

থাকে - নাম্বাস সেটা বোঝে আর সবাইকে জানায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী জনের ফিরে আসার দিন হিসাবে চিহ্নিত, সেইদিন ধর্মীয় উৎসব পালন হয়। সব দেখে অটেনবারো তার বন্ধু স্যামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন এই আদিবাসীরা এত বছর ধরে অপেক্ষা করে চলেছে জনের পুনারগমনের জন্য - এতদিনে তো তাদের বোধোদয় হওয়ার কথা। স্যামের স্পষ্ট উত্তর - যদি আমরা ২০০০ বছর ধরে খ্রীষ্টের পুরাগমনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারি, এদের ঊনিশ বছর কি খুব বেশি সময়?

মিম

মিম নিয়ে আমি আগেও লিখেছি, তাই মিমতত্ত্ব বুঝতে গেলে সেটা মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে পড়ে দেখা যায়। তবে মিম-তত্ত্ব থেকে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে আমি নিজেরও কিছু উদাহরণ দিলাম।

আমাদের সমাজে জাতিভেদপ্রথার মূলে আছে এরকমই বংশানুক্রমে মিম প্রবাহ। একেকটি জাতির মধ্যে একেকটি কৌশল-মিম যুগযুগান্ত ধরে অপরিবর্তিত অবস্থায় বাহিত হচ্ছে - কেউ সেই অনুযায়ী কামার, কুমোর, নাপিত, কসাই, পূজারী বা সোনার বনিক, এসব জাতি তৈরী হয়েছে। আজকে একটা গ্রামে এক কুমোর যা কৌশল ব্যবহার করে মাটির কলস বানায় তার সাথে তার ঠাকুর্দার কৌশলের কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং মিমের নকল হওয়ার ক্ষমতা সহজেই অনুমেয়।

ইসলামের সুফিবাদ দক্ষিণ এশিয়াতে জনপ্রিয় হওয়ার মূল কারণ এর মেমেপ্লেক্সটি আরব উপদ্বীপের ইসলামের সাথে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মিম গুলোকেও স্থান দিয়েছিল। তাই বাস্তবে দেখা যায়, যত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে যাওয়া যায় তত এদের ধর্মমতের সাথে পারসিক ও মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মতের মিলল পাওয়া যায়। আবার বাংলাদেশের ইসলামিক মত এদের তুলনায় ভিন্ন।

ভারতে কার্গো কাল্টের উদাহরণ কম নেই। কালীপূজোর আমদানি ঘটেছে এদেশে অনার্যদের হাত ধরেই। তারাও হয়ত পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের মত প্রথমে আর্যদের মত করে পুজো করতেই ব্যস্ত ছিল। পরে সমাজ মিলে মিশে গেলেও অনার্যরা নিচুজাতি অস্পৃশ্য বলে গণ্য হয়েছে কিন্তু মিম-বিনিময়ের ফলে কিছু অনার্য ধর্মবিশ্বাস স্থান করে নিয়েছে আর্যপ্রধান মূল ভারতীয় মেমেপ্লেক্সে।

কিছুদিন আগে আরো একটা ভাল উদাহরণ পড়লাম। ওড়িশায় যেসব জায়গায় বৌদ্ধস্তুপ বা ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, দেখা গেছে সেই অঞ্চলে বসবাসকারি আদিবাসীরা সেই ভগ্নাবশেষের মূর্তি নিয়ে পুজো শুরু করেছে। তাদের ধর্মমতে এ আরেক মিমের সংযোজন।

মেমেপ্লেক্সের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ মনে হয় কনস্পিরেসি থিয়োরীতে পাওয়া যায়। প্রতিটি কনস্পিরেসি থিয়োরী এক একটি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রমাণ - এমনভাবে তৈরী যাতে তাকে চূড়ান্তভাবে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাও ভুল প্রমাণ করা যায়না।

ড্যানিয়েল ডেনেটর প্রবণতাগত তত্ত্বের নিদর্শন আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি। এখনো মার্কেটিং স্কিলের প্রধান স্তম্ভ হল অন্যের প্রবণতা আগে থেকে সঠিকভাবে অনুমান করা। এই দক্ষতার অভাবে আমাদের সমাজে যে কেউ

অসামাজিক আখ্যা পেতে পারে। আদিম মানুষের আদিম সমাজের মধ্যে তা যে আরো বেশি মাত্রায় ছিল, তা সহজেই অনুমেয় - কারণ সেই সমাজে অসামাজিক আখ্যা পাওয়া মৃত্যুদন্ডের সামিল।

** ধর্মের উৎস সন্ধানে প্রবন্ধটি রিচার্ড ডকিন্সের ঈশ্বর প্রবঞ্চনা (The God Delusion) বইয়ের The Roots of Religion অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত।*

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা। ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com